প্রফুল্ল-নির্ম্মাল্য।



"—Trailing clouds of glory, do we come
From God, who is our home."



প্রকাশক, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, বি, এল

PRINTED BY
K. P. CHAKRAVARTI AT THE JAYANTI PRESS,
25, PATALDANGA STREET, CALCUTTA.



ফাগুবাবু

উৎসর্গ।

ত্রিদিব হইতে শিশু ! এসেছিলে ধরাতলে,
প্রফুল্ল-কোমল কান্তি, তুমি শান্তি-প্রস্রবণ ;
রচিয়াছি যে নির্ম্মাল্য তব পুণ্য স্মৃতিদলে,
তোমারি উদ্দেশে তাহা করিলাম সমর্পণ।

তোমার
"ক'নে কাকা"।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

চিরঞ্জীবেষু—

ভাই মুনীন্দ্র !

তোমার "প্রফুল্ল-নির্ম্মাল্য" সংশোধনের ও ভূমিকা লেখার ভার তুমি আমায় দিয়াছিলে। কিন্তু আমি ছাপার ভুল ছাড়া আর কিছুই সংশোধন করিতে পারি নাই,—ভূমিকাও লিখি নাই, । ইহার ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। ইহা তোমার হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, ইহা তোমার প্রাণের ভাষা, ইহাতে কাহারও হস্তক্ষেপ চলে না। ইহা পড়িবার সময় পাঠককে নিঃশব্দ ও নিষ্পন্দ হইতে হয়।

প্রফুল্ল একটী স্বর্গীয় পারিজাত, মর্ত্ত্যে আসিয়া ঈষৎ প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব সুষমায় ও সৌরভে সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া চলিয়া গেল ! এই স্বল্প-দিনে সকলের হৃদয়ে

যে একটু দিব্য জ্যোতিঃ রাখিয়া গেল, তাহার ধ্বংস নাই। শুনিয়াছি,—যোগারূঢ় মহাত্মারা ঘটনাক্রমে যোগ-ভ্রষ্ট হইয়া মহাকুলে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং মানব-হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব দেবভাব সঞ্চারিত করিয়া মুক্তিধামে প্রস্থান করেন। একি সেই যোগভ্রষ্ট দেবশিশু!

কলিকাতা।
২৪শে আশ্বিন,
১৩১৪ সাল।

স্বস্তি—
শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা



প্রফুল্ল-নির্ম্মাল্য

উন্মেষ।

ভক্ত কবি বলিয়াছেন—

"মন্ত্রে তন্ত্রে জপে তপে ব্রতে প্রতিমায়,
কিম্বা তীর্থে কভু কেহ নাহি পায় তাঁয় ;
ভকতবৎসল হরি ভকত-জীবন,
কেবল ভকতি দিলে মিলে সেই ধন।"

এমন 'ভকতি' কত দিনে হয়—এমন ভক্ত কত দিনে হইতে পারা যায়? ঐ যে 'কেবল ভকতি', সে কি এক

দিনের—এক বৎসরের—না, এক জীবনের? তুমি সারা জীবনটা হরিনামের মালা ঠক্‌ঠকাইলে; তুমি উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, "হরি হে দীনবন্ধু, পার কর ভবসিন্ধু" বলিয়া লোকসমাজে ভক্তশ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত হইলে; তুমি 'গোবিন্দ-ভবন', 'কেশব-নিবাস', 'জনার্দ্দন-মন্দির' স্থাপিত করিয়া অনায়াসলভ্য মুক্তির আয়োজন করিলে;—কিন্তু মুক্তি ত বহুদূরের কথা;—তুমি যখন মহাপ্রস্থানের প্রশস্ত পথে দণ্ডায়মান হইয়া সংসার হইতে বিদায় লইবার উদ্যোগ করিতেছ, তখন তোমার কি অবস্থা? সেই তপ্ত শ্বাস, সেই হা হুতাশ, সেই মায়া, সেই অশ্রুজল, সেই মৃত্যু-বিভীষিকা—সেই সব! একজন চিরকাল মহাপাতক করিয়া আসিয়া মৃত্যুকালে যে কষ্ট পাইয়াছিল, যেরূপ মুখব্যাদান করিয়া অন্যের ভীতির কারণ হইয়াছিল, তুমি আজীবন পুণ্যধর্ম্ম করিয়া আসিয়াও মৃত্যুকালে হয় ত সেইরূপই—মহাপাতকীর মত হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিয়া ফেলিলে! তবে, হে পুণ্যাত্মন্, পুণ্যাত্মা তোমাতে ও মহাপাতকীতে প্রভেদ কি?

মৃত্যুটাকে আমি সুদীর্ঘ বিরহ বলিয়া মনে করি। তুমি এই বিরহের ভয়ে, আত্মীয় স্বজনকে আর দেখিতে পাইবে না, ধন দৌলত আর ভোগ করিতে পাইবে না, এই ভাবিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় একবারে অস্থির হইয়া পড়িলে। যাঁহার কৃপায় তুমি এ সংসারে আসিয়াছ, যাঁহার দয়ায় তুমি এত দিন সংসারে থাকিয়া সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিলে, যাঁহার অনুকম্পায় তোমার সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য মুক্তির লাভ হইতে পারে, আর যাঁহারি বিধানে তোমায় সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে; মায়াজড়িত হইয়া সংসার হইতে বিদায় লইবার কালে, তুমি তাঁহাকে একবার চিন্তা করিবারও অবসর পাইলে না। তখন কোথায় রহিল তোমার সেই 'কেবল ভকতি'? 'কেবল ভকতি' থাকিলে চরমসময়ে কি আর এমন অবসন্ন হইতে হয়? যাহার 'কেবল ভকতি' আছে, সে মৃত্যুকে বন্ধু মনে করে, সে মৃত্যুতে শান্তি পায়, সে মৃত্যুতেও সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, ঐ যে 'কেবল ভকতি', সে কি একদিনের? না, একজীবনের? বুঝি এ ভক্তি এক

জীবনের নহে, বুঝি এ ভক্তি অনন্ত জীবনের! এ ভক্তি একজীবনের হইলে, তুমি হরিনামের মালা ঘুরাইয়াও মৃত্যুমুখে আপনাকে ভুলিয়া যাও কেন? আর একজনই বা সুখশান্তিতে ভবের বাসা তুলিয়া দেয় কেন? তুমি হরিনাম করিয়া চুল পাকাইলে, তথাপি তোমার মায়া-ঘোর কাটিল না, তুমি জাগিয়া ঘুমাইয়া রহিলে,—তোমার সেই জ্বালা, সেই যন্ত্রণা—সুখ নাই, শান্তি নাই—সংসার-সুখ উপভোগ করিবার জন্য তুমি সর্ব্বদাই ব্যাকুল। আর একজন সংসারে আসিল,—আপনি হাসিয়া, অপরকে হাসাইয়া দিন কাটাইল, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা বুঝিল না, সুখে দুঃখে উদাসীন রহিল; তাহার পর, ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়া জীবন-সন্ধ্যায় হাসিতে হাসিতে আপন দেশে চলিয়া গেল। সে সময়ে তাহার এতটুকুও মুখবিকৃতি ঘটিল না; সে 'যদুকুল-নলিন-দিনেশ' নাম লইয়া সংসারাশ্রম হইতে অবসর গ্রহণ করিল। তাহার অনন্ত জীবনের কর্ম্মফলে এবং 'কেবল ভকতি'-গুণে সে তাহার 'সেই ধনকে' চিনিয়াছে;—তাহার আর 'মন্ত্র তন্ত্র ব্রত জপে'র প্রয়োজন কি? তাহার হৃদয়-রাস-মন্দিরে—

সচ্চিদানন্দ অহরহঃ বিরাজ করিতেছেন,—আর অন্য তীর্থে কাজ কি? যে রত্ন চিনিয়াছে, সে কাচখণ্ডে রত্ন দেখিবে কেন?

একটী পবিত্র বালক, অলৌকিক চরিত্র লইয়া দিন কয়েকের জন্য 'ভবে এসে, খেল্‌তে ব'সে', এই 'কেবল ভকতি'র মহিমা, তাহার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার মধুময় জীবনকাব্যের অতীত ঘটনাবলী, ভগবদ্ভক্তির মধুরতা বিকাশ করিয়া, স্মৃতি-মন্দিরে যে চিত্রপট সংরক্ষিত করিয়া গিয়াছে, এ প্রবন্ধ তাহারি প্রতিকৃতি মাত্র। সহৃদয় পাঠক, মনশ্চক্ষে দেখিয়া লও, কি এক অপূর্ব্ব প্রভায় সে সম্মোহন ছবি ধীরে ধীরে আবরণমুক্ত হইতেছে! এ যে সেই চিরপ্রিয় চিরমধুর প্রফুল্লকান্তি বালযোগী অশরীরী আত্মার দীপ্তি-উন্মেষ!!!





জন্ম।

১৩০২ সালের ফাল্গুন মাস—দোলযাত্রা। চারিদিকে তুমুল কোলাহল। অতি প্রত্যুষকাল হইতেই সে আনন্দ-রোল উত্থিত হইয়াছে—বিশেষতঃ পশ্চিম দেশে। পশ্চিমে 'ফাগুয়া'র দিনে, আনন্দ-তুফানে দেশটা তোল্‌পাড় হইয়া উঠে। সে অবাধ আনন্দের তুমুল ধ্বনি দূর হইতে শুনিলে মনে হয়—বুঝি রণ-কোলাহল! এ উহার গাত্রে পিচ্‌কারি মারিয়া 'লালে লাল' করিয়া দিতেছে, সে প্রতিদ্বন্দ্বীর গলা চাপিয়া ধরিয়া 'শুখা ফাগে' আচ্ছা করিয়া মুখটা

রঞ্জিত করিয়া শাখামৃগের কমনীয় মূর্ত্তি লোকসমাজে প্রকটিত করিতেছে—সে মূর্ত্তি দেখিয়া সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলাগণ পর্য্যন্ত হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। একজন্ একজনের পশ্চাদ্ধাবনে মুক্তকচ্ছ ;—পশ্চাদ্ধাবিত লোকটী ব্যাঘ্রভয়ে ভীত শশজাতির ক্ষিপ্রগতি অনুকরণ করিয়া সুদীর্ঘ পদসঞ্চালনে যত্নবান্ ; অবশেষে দুই-জনেই ফাগ্ মাখিয়া রঞ্জিতকলেবর—নয় ত আর্দ্র মৃত্তিকায় কাশীধামের ভণ্ডযোগী সাজিয়া হাস্যোদ্দীপক হাবভাবে নৃত্য করিতেছে। পশু পক্ষী; তরু লতা, নদী নালা, সরিৎ সরোবর, সব লালে লাল হইয়া গিয়াছে। 'ফাগুয়া'র দিন পশ্চিমে কি আর কালো থাকিবার যো টী আছে ? যে থাকিবে, সে হিন্দু নহে।

এইরূপ আনন্দের দিনে ভাগলপুরে চন্দ্রকুমার পাল মহাশয়ের বাটীতে আনন্দোৎফুল্ল শঙ্খধ্বনি হইল। বেলা তখন ৮টা। আত্মীয়েরা সে শঙ্খধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া, যথায় শঙ্খধ্বনি হইতেছিল, সেই স্থানে উঠি পড়ি ভাবে ছুটিল। তথায় উপস্থিত হইয়া সকলে কি দেখিল ? পাল মহাশয়ের আর একটী দৌহিত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ

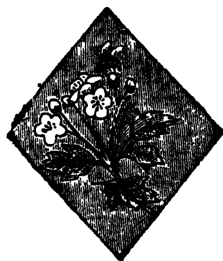
হইয়াছে;—নবজাত শিশু প্রসূতির পার্শ্বে অবস্থান করত বালার্কের ন্যায় গৃহস্থল আলোকিত করিয়াছে।

পাল-পরিবারে আজ আনন্দের সীমা নাই। কেহ বলিলেন, "আজ গৌরাঙ্গের জন্মদিন, এ পুত্র-সন্তান যখন আজিকার দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন ইহাকে সেই আখ্যায় আখ্যাত করিব।" কেহ সেই কথায় সায় দিতেছে, কেহ বা একটা নূতন উপমার—নূতন কথার অবতারণা করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই কাহারো পরিতৃপ্তি হইতেছে না। অনেক বকাবকি ঝকাঝকির পর শিশুর স্নেহময়ী মাতামহী স্থির করিলেন, যখন 'ফাগুয়া'র দিন এই সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন ইহাকে 'ফাগু' বলিয়া ডাকা যাইবে। এ কথায় আর কেহ অন্যমত করিল না। আর একবার আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল, আর একবার শঙ্খনিনাদে চারিদিক্ নিনাদিত হইল—সে কোলাহল 'ফাগুয়া'র আনন্দ-কোলাহলের সহিত মিশিয়া গেল।

একজন পরমাত্মীয় সেই সময়ে এক মুঠা ফাগ লইয়া সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের গাত্রে ছড়াইয়া দিয়া হাসিয়া বলিলেন—

"ফাগের দিনে এসেছ, যাদু,
মাখ চাট্টি ফাগ্ ;
খেও বেশী ঘরের ভাত
কর যদি রাগ।"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সদ্যোজাত সন্তানও বুঝি সে কৌতুক বুঝিতে পারিল না বুঝিলে ঠিক্ সেই সময়ে "টঁ্যা" করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া সে জননীর নিকট নালিশ করিল কেন?





হাঁটি হাঁটি পা পা।

শিশু চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যথাকালে নামকরণ কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার সুন্দর অধরে সুমধুর হাসিটুকু সর্ব্বদাই ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। এই কারণে, তাহার মাতা আদর করিয়া নাম রাখিলেন, 'প্রফুল্ল'। প্রফুল্লের ভ্রাতা-দিগের নামের পাশে একটী করিয়া 'চন্দ্র' আছে—শরচ্চন্দ্র, নির্ম্মলচন্দ্র, প্রভাতচন্দ্র ইত্যাদি। সেই 'চন্দ্র'টী প্রফুল্লের সহচর হইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না—ধীরে ধীরে আসিয়া 'প্রফুল্লে'র সহিত মিশিয়া গেল। 'চন্দ্রে'র

সহিত মিলিত হইয়া শ্রীমান্ ফাগু এখন প্রফুল্লচন্দ্র হইয়াছে—সোণায় সোহাগা!

প্রফুল্লচন্দ্র শিশুভাষায় এখন অনেক কথাই কহিতে পারে। তাহার সেই বিশাল ললাট কুঞ্চিত করিয়া, সমুজ্জ্বল নেত্রযুগল বিস্তৃত করিয়া, ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছগুলি টানিয়া টানিয়া সে যখন বলে, "দুতু কোলো না, বাবা মালবে", তখন তাহাতে আর শিশুমূর্ত্তি থাকে না। সে মূর্ত্তিতে এক দিব্য প্রভা পড়িয়া তাহাকে অলৌকিক করিয়া তুলে।

বড় বড় চক্ষু দুইটী স্থির করিয়া যখন সে আকাশ-পানে চাহিয়া থাকিত, তখন মনে হইত সে চক্ষু বুঝি এ জগতের নহে। আবার যখন সে চক্ষুতে চপলতা প্রকাশ পাইত, তখন মনে হইত—সে চক্ষু যেন কিছু অন্বেষণ করিতেছে,—যেন তাহা খুঁজিয়া পাইতেছে না, প্রশান্ত নীলিমায় তাহার আকাঙ্ক্ষার ধন যেন লুকোচুরী খেলিতেছে, সে তাহা ধরিতে চাহে, সে—সে নীলিমায় মিশিতে চাহে। সে প্রফুল্ল নয়নে কি কমনীয়তা, কি মধুরিমা, কি পবিত্রতা! প্রফুল্লের চক্ষু দেখিয়া তাহার

মেজ জেঠা মহাশয় বলিতেন—"He has a dreamy far-away look, which is not of this world." কথাটী সম্পূর্ণ সত্য। সে চাহনি দেখিয়া, যাঁহারা বুঝিবার, তাঁহারা বুঝিলেন,—এ দেবশিশু—মরজগতের নহে—শীঘ্রই মায়া কাটাইবে।

প্রফুল্ল এখন রঙ্গভঙ্গ করিয়া আপনি হাসে ও পরকে হাসায়। উঠিতেছে, বসিতেছে, চলিতেছে, পড়িতেছে ;—কিন্তু যেমনি তাহার কার্য্যের প্রতি অন্যের চক্ষু পড়িল, অমনি সে একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল ;—সে শিশু হইয়াও একটু নির্জ্জনতা ভালবাসিত।

সে যখন প্রথম চলিতে শিখিয়াছিল, তখন তাহার জননী তাহাকে শিখাইয়াছিলেন, 'হাঁটি হাঁটি পা পা'। এ কথা শিশু বিস্মৃত হয় নাই। যখনি তাহার অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুকে সে নিকটে পাইত, তখনি তাহার হস্ত ধরিয়া বলিত, "হাঁতি হাঁতি পা পা তোলে তোলে বালী দা!" এই কথা বলিত আর কুল্ কুল্ করিয়া হাসিত। শিক্ষকের পদে আসীন হইয়া শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র যখন তাহার শিষ্য—অন্য এক শ্রীমান্‌কে 'হাঁতি হাঁতি

পা পা' শিখাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিত, শিষ্যটী হয়ত অল্পবয়স্ক গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত। কিন্তু গুরুমহাশয় ছাড়িবার পাত্র নহেন। কাজেই যুদ্ধের সূচনা হইত। শিষ্য গুরুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় ক্রন্দনের সুর তুলিত। তখন গুরু দয়াপরবশ হইয়া শিষ্যকে ছাড়িয়া দিত। কিন্তু নিষ্কৃতিলাভের পরেও অনেক সময়ে শিষ্যের রোদন থামিত না। উপায়ান্তর না দেখিয়া কিছু খাদ্যসামগ্রী আহরণ করিয়া কিম্বা একটা খেলানা লইয়া গুরু শিষ্যকে উপহার দিত। যদি তাহাতেও শিষ্যের মন না উঠিত, তাহা হইলে গুরু শিষ্যের গলা জড়াইয়া বলিত, "গাং তুন্‌বি, বাই?" এই বলিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল হাত দু'খানি ঘুরাইয়া, গুরু গান জুড়িয়া দিত—

"হলি তাকুল ব'তে তাকে
কতম্‌ গাতের দালে;
দে তেলেতা বদ্দ কাঁদে
বাল বাত্তেনা তালে।"

গুরুর মুখে এই অভিনব শাস্তির কথা শুনিয়াই হৌক কিম্বা সম্মোহন সঙ্গীতমন্ত্রেই হোক, শিষ্যের রোদন থামিয়া যাইত। গুরু শিষ্যে আবার ভাব হইত। গুরুর হস্ত ধরিয়া 'হাঁতি হাঁতি পা পা' করিতে শিষ্য আর কোনো আপত্তি করিত না।





খেলা-ধূলা।

"His blood is hot, his blow is strong,
—Cruelty all around ;
Meddled wi' the nest, passing along,
Killed whate'er he found."

এরূপ ক্রীড়াপ্রবৃত্তি প্রফুল্লচন্দ্রের কোমল হৃদয়ে দখল সাব্যস্ত করিতে পাইত না। সে যখন অতি শিশু, তখন হইতেই জীবজন্তুর প্রতি তাহার কেমন একটা ভালবাসা ছিল। সে ভালবাসাকে যদি উদার অনন্ত বলিতে দোষ না থাকে, তবে তাহা তা'ই। প্রফুল্ল পিপীলিকাটীর পর্য্যন্ত কখনো প্রাণবধ করে নাই। অন্য কেহ করিলে,

তাহার কষ্ট হইত। ইহা যদি সহজ ধর্ম্মভাবের লক্ষণ হয়, তবে তাহা হইতে প্রফুল্ল বঞ্চিত ছিল না।

পক্ষীর মধ্যে তাহার বড় ভালবাসার সামগ্রী ছিল্ 'টিয়া'। একদিন প্রফুল্ল ও তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভাতচন্দ্র পথের ধারে একটী অর্দ্ধমৃত টিয়া পাখী দেখিতে পায়। বোধ হয়, কোনো গৃহস্থ পক্ষীটীর অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া অকালে রাজপথেই তাহার সজ্ঞান গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ভ্রাতৃযুগল করুণাবশে পক্ষীটীকে সযতনে আপনাদের বাটীতে আনিল। প্রফুল্লের পুণ্যময়ী পিতামহী পৌত্রদিগের এইরূপ শৈশব-করুণা দেখিয়া সবিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন এবং আগ্রহ সহকারে স্বয়ং পক্ষীটীর পরিচর্য্যার ভার লইলেন। পক্ষী সুস্থ ও সবল হইয়া, প্রফুল্ল ও তাহার সহোদর প্রভৃতিকে প্রফুল্ল করিতে লাগিল; পিতামহীর পক্ষিপালন সার্থক হইল। শিশু প্রফুল্ল 'গঙ্গারাম'কে হরিনাম শিখাইতে সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। প্রফুল্ল ও তাহার পিতামহীর যত্নে পক্ষীর কিছু শিক্ষালাভও ঘটিয়াছিল। কিন্তু যে 'শিকল-কাটার জাত্', তাহার কৃতঘ্ন না হইবার কোনো

কারণ নাই। শুকরাজ একদিন পিঞ্জরদ্বার মুক্ত পাইয়া পলায়ন করিল। প্রফুল্ল সে দিন বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। পক্ষীর পলায়নের নিমিত্ত সে কাতর হয় নাই—পথের ধারে পড়িয়া আবার পাছে 'গঙ্গারাম' অপমৃত্যুর মুখে পড়ে, এই ভাবিয়া প্রফুল্ল ব্যাকুল হইয়াছিল। পক্ষীটাকে পুনর্ধৃত করিবার জন্য তাহার সমস্ত পুঁজিপাটা খরচ করিতেও সে প্রস্তুত ছিল। পক্ষীও যেন ধরা দিবার জন্য দুই এক দিন বাটীর আশেপাশে ঘুরিয়াছিল। কিন্তু ব্যাধের দল দেখিয়া সে বনান্তরালে চলিয়া গেল। এ ঘটনা ভাগলপুরে ঘটে।

চিত্রবিদ্যার উপর প্রফুল্লের সবিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত। সে এখন পাঁচ বৎসরের;—'বড় গাছ', 'ছোট পাতা', 'লাল ফুল' প্রভৃতি পড়িয়া সে সেই শৈশবেই বুঝিল,—শুধু তোতাপাখীর মত পড়া পড়িলে চলিবে না। আপনার 'কিণ্ডারগার্টেন' সে আপনিই করিয়া লইল। বড় গাছ, ছোট পাতা, লাল ফুল চিত্রিত করিয়া বালক অপার আনন্দ ভোগ করিত। অন্যে তাহার চিত্রকে 'কাকের ঠ্যাং' 'বকের ঠ্যাং' বলিলেও চিত্রাঙ্কনে

সে কিছুতেই উদাসীন হইত না। মধ্যে মধ্যে মনুমেণ্টের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, সে সকলকে দেখাইত এবং হাসিয়া বলিত, "এটা স্বর্গের সিঁড়ি।"

আর একটী চিত্রের, অঙ্কন করিতে তাহার আগ্রহাতিশয্য দেখা যাইত। ধীর লহরীমালায় বিশোভিত হইয়া নির্ঝরিণী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে—একখানি ক্ষুদ্র তরণী তরঙ্গের মাথায় মাথায় হেলিতেছে, দুলিতেছে—কর্ণধারও তৎসঙ্গে তালে তালে উঠিতেছে, নামিতেছে। কল্লোলিনীর বেলাভূমি-সান্নিধ্যে একখানি পর্ণকুটীর দেখা যাইতেছে, তাহার আশেপাশে বৃক্ষ লতা গুল্মাদি জন্মিয়া স্থানটীকে একরূপ বনভূমিতেই পরিণত করিয়াছে। ইহা কবিকল্পনার চিত্র—এ চিত্র অঙ্কিত করিতে বালক কোথা হইতে শিখিল!

এক দিন বহুবাজারের রাস্তায় 'মোটর্ ট্রাম' দেখিয়া আসিয়া হুবহু সেই চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রফুল্ল সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। মোটর্ ট্রাম অঙ্কিত করিয়াও সে পরিতৃপ্ত হইল না;—ভাবিল, মোটর্ ট্রাম চালাইতে হইবে। কিন্তু কি করিয়া তাহার চিন্তা

কার্য্যে পরিণত হয়? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এক উপায় স্থির করিল। তাহার দাদা প্রভাতের একখানি কাঠের গাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সেখানি ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ীর অনুরূপ। প্রফুল্ল অনেক কৌশলে সেখানিকে মোটর্ ট্রামে পরিণত করিল। তৎপরে সুতা ঝুলাইয়া, মোটর ট্রামের অনুকরণে গাড়ীর মাথায় Trolly ও rod লাগাইয়া, ফাগুবাবু মোটর্ ট্রাম চালাইতে লাগিল। রাঙ্গা রাঙ্গা পুতুলগুলি ড্রাইভার্, কন্ডাক্টার্ ও আরোহীর স্থান অধিকার করিত; টুক্রা টুক্রা নীলবর্ণের কাগজ ট্রামের টিকিট হইত। আরোহি-বর্গকে অবশ্য টিকিটের মূল্য দিতে হইত—সেগুলি মাটির ঢেলা। বালক মাটির ঢেলাটাই ভাল চিনিয়াছিল!

বলিতে ভুলিয়াছি, ফাগুবাবু গাড়ীর মাথায় স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিল, Calcutta Motor Car Coy. Proprietors—Sarbadhikari Bros." যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এরূপ নামের কোনো কোম্পানির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না। এই নামটী বালকের স্বকপোল-কল্পিত। গাড়ীখানি এখনও গৃহে বিদ্যমান।

কলকব্জা লইয়াই প্রফুল্ল সারাদিন নাড়াচাড়া করিত। এটা ভাঙ্গিতেছে, ওটা গড়িতেছে, সেটা মেরামত করিতেছে—ইহাই তাহার দৈনিক কার্য্য ছিল। কলকব্জা মেরামতকালে যদি কেহ ফাগুবাবুকে ডাকিয়া ডাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইত, তথাপিও বালকের উত্তর পাইত না।

মধ্যে মধ্যে ফাগুবাবু বেশ মুরুব্বিয়ানা-ভাবে তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বাম হস্তের উপর বাম গণ্ডটী রাখিয়া দক্ষিণ করের অঙ্গুলিগুলি সঞ্চালন করিত। সেটা শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্রের জমীদারি চাল্। কিন্তু প্রফুল্লের পিতা, পুত্রের এই জমীদারি চাল্ দেখিয়া মনে মনে ভীত হইতেন—ভাবিতেন, বালক কি এই বয়সেই সকল সাধ পূর্ণ করিয়া লইতেছে!

প্রফুল্লচন্দ্রের একটী খেলার 'ডাক্তারখানা' ছিল। সে তাহার নাম দিয়াছিল 'স্বদেশী ফার্ম্মাসী'। বালক যখন তাহার 'ফার্ম্মাসী'র এইরূপ নাম দিয়াছিল, তখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। এই ঘটনার অনেক পরে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। প্রফুল্ল বাছিয়া বাছিয়া

কোথা হইতে এবং কেন যে এ নামের সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। আর এক কথা—'ফার্ম্মাসী' কথাটার বর্ণশুদ্ধি বিষয়ে বালকের ভ্রমপ্রমাদ না ঘটিলেও সে—কথাটার উচ্চারণ জানিত না। সেই জন্য সে 'স্বদেশী ফার্ম্মাসী' না বলিয়া 'স্বদেশী পণ্ডিচারী' বলিত। ভূগোল পাঠ করিয়া কি অন্য কোনো কারণে বালক 'পণ্ডিচারী' কথাটার ব্যবহার করিত, গ্রন্থকারের তাহা জ্ঞাত নহে। 'পণ্ডিচারী' লইয়া অনেকেই প্রফুল্লকে বিদ্রূপ করিত। কিন্তু তাহাতেও 'পণ্ডিচারী'র উপর সে শ্রদ্ধাহীন হয় নাই।

সে যাহা হউক, অনেকগুলি পুরাতন ঔষধের শিশি বোতল সংগ্রহ করিয়া প্রফুল্ল তাহার ডাক্তারখানাটী সজ্জিত করিয়াছিল। ডাক্তার সাজিয়া, চেয়ারে বসিয়া সে ঔষধ দিবার ভান করিত। এ দৃশ্য দেখিয়া বালকের আত্মীয়েরা না হাসিয়া থাকিতে পারিতেন না।

'স্বদেশী ফার্ম্মাসী' হইতে একদিন একটু উপকারও পাওয়া গিয়াছিল। প্রফুল্ল ও তাহার ভ্রাতৃবর্গ বাটীসংলগ্ন মাঠে ফুটবল খেলিতেছে, এমন সময়ে একটী বালক

গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইল। প্রফুল্লের মেজদাদার ধারণা ছিল, এইরূপ আঘাতে 'সায়োনা' সবিশেষ উপকারী। কিন্তু তখনি সায়োনা কোথায় পাওয়া যায়? প্রফুল্ল সে কথা শ্রবণানন্তর বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং তাহার 'স্বদেশী পণ্ডিচারী' হইতে একটী শিশি লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেইটী সায়োনার শিশি কি না। সেইটীই সায়োনার শিশি বটে। তৎক্ষণাৎ ঔষধ আঘাত-প্রাপ্ত বালকটীর ক্ষতমুখে লাগাইয়া দেওয়া হইল। আহত বালকের তাহাতে বেশ উপকার হইয়াছিল। ক্রীড়া-ব্যপদেশেও যে লোকের উপকার করিতে পারা যায়, ইহা তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রফুল্লের আর একটী মজার খেলা ছিল—'ইঞ্জিন দাদা।' ৺বৈদ্যনাথে বেড়াইতে যাইয়া সে এই ক্রীড়ারঙ্গের উদ্ভাবন করিয়াছিল।

বৈদ্যনাথ-জংশন হইতে দেওঘর পর্য্যন্ত Burn কোম্পানীর রেল আছে। প্রফুল্ল যে সময়ে বৈদ্যনাথে বেড়াইতে যায়, সেই সময়ে ঐ রেলে পাঁচু সিং নামে একজন গার্ড (Guard) ছিল। পাঁচু সিং প্রফুল্লকে

এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাহার কথা শুনিয়া সে না করিতে পারিত, এমন কার্য্যই ছিল না। পাঁচু সিং যখন ট্রেন লইয়া বৈদ্যনাথ-জংশন হইতে দেওঘর-অভিমুখে যাত্রা করিত, "ইঞ্জিন দাদা—দাঁড়া, দাদা! ইঞ্জিন দাদা—দাঁড়া, দাদা!" বলিয়া, 'লাল নিশান' হস্তে, প্রফুল্ল তৎ-পশ্চাৎ ছুটিতে থাকিত। পাঁচু সিং বালকের দুর্জ্জয় সাহসে প্রীতিলাভ করিয়া ট্রেণ থামাইত এবং প্রফুল্লকে তুলিয়া লইত। ফাগু বাবু 'লাল নিশান,' 'নীল নিশান' উড়াইয়া পাঁচু সিংএর মাথা খারাপ করিয়া দিত। ইহাকেই বলে ভালবাসার অত্যাচার!

এ অত্যাচার আরো অনেকের উপর হইত। অনেকের মধ্যে একজন ছিল—'সিরিয়া'। সিরিয়া প্রফুল্লের ন কাকার উৎকল ভৃত্য। সে লম্বা চুল রাখে, 'মু পারিমু না' বলে, আর 'পর্ভূ জগড়নাথে'র নাম শ্রবণ করিলে ভক্তিভরে প্রণাম করে। প্রফুল্ল ভাবিল, সিরিয়া 'কঁধা' বহিবার উপযুক্ত বটে; কিন্তু তাহার পৃষ্ঠে কিম্বা স্কন্ধদেশে চাপিয়া 'ঘোড়া ঘোড়া' খেলিলেও মন্দ হয় না। এরূপ ভাবিবার কারণও ছিল। ফাগুবাবু গাড়ী ঘোড়াটাই

অধিক ভালবাসিত। সে সেই কারণেই সিরিয়াকে 'কঁধা বহা' হইতে অব্যাহতি দিয়া তাহাকে 'ঘোড়া' করিয়া লইল। বালক সিরিয়াকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া, তাহার স্কন্ধে চাপিয়া, তাহার দীর্ঘ কেঁশগুচ্ছগুলি 'লাগাম' করিয়া, ঘোড়া হাঁকাইবার অভিনয় করিত। অন্য কেহ এ অত্যাচার করিলে হয় ত সিরিয়া 'মু পারিমু না' বলিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইত; কিন্তু ফাগুবাবুর নিকট 'পারিমু না' খাটিত না। ফাগুবাবুর সংসর্গে যে আসিত, তাহাকেই ফাগুবাবু স্নেহ-মন্ত্রে বশীভূত করিয়া ফেলিত। যে দিন ফাগুবাবু সিরিয়ার স্কন্ধে না চাপিত, সে দিন ভক্তের প্রাণ কাতর হইত।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের খেলার আস্‌বাব্-পত্রও যথেষ্ট বাড়িতে লাগিল। এক্ষণে তাহার জীর্ণ কাঠের বাক্সে হাতুড়ি, পেরেক্, ভাঙ্গা টিন মাটির ঢেলা, ছুরী, কাঁচি, আল্‌পিন্, টুক্‌রা টুক্‌রা কাঠ প্রভৃতি অনেক দ্রব্যই স্থান পাইয়াছে। কোন্ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে, কি জানি কখন্ কি আবশ্যক হয়, তাহার ত ঠিক নাই। তাহা ছাড়া প্রফুল্লের জেঠা কাকাদের যখনি কোনো

দ্রব্য আবশ্যক হইত, বিশ্বকর্ম্মা প্রফুল্লচন্দ্র সংবাদপ্রাপ্তি-মাত্রেই তাহা প্রফুল্লচিত্তে সরবরাহ করিত। গ্রন্থকারের একদিন গোটা কয়েক পেরেকের দরকার হয়। প্রফুল্লের 'ন্যাতা, ক্যাতার হাঁড়ি'র কথা স্মরণপথে উদিত না হওয়ায়, সেগুলি বাজার হইতে সংগ্রহ করিবার কথা হইতেছিল। এ কথা প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ণগোচর হইলে সে আবশ্যক পদার্থগুলির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিল, "কাকা, তুমি কি জান না, আমার মিস্ত্রিখানায় সকল জিনিসই পাওয়া যায়?"

আর এক দিনের ঘটনা—গ্রন্থকার একটী গ্রামোফোন্ ক্রয় করিয়া আনিয়া, 'আয় রে আয় হরি বোলে বাহু তুলে নাচি আয়' রেকর্ডখানি বাজাইতেছিলেন। প্রফুল্ল মন্ত্রমুগ্ধের মত গানটী কর্ণমুখে গিলিতেছিল। যখন সে গানটীর শেষ হইয়া গেল, তখনো বালক নীরব নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে যখন আর এক-খানি রেকর্ড কলে বসাইয়া দেওয়া হইল, প্রফুল্ল তখন বলিল, "ঐ খানাই ('আয় রে আয় হরি বোলে') আবার বাজাও।" একজন সে কথায় বাধা প্রদান করিয়া বলিল,

"না, না, নতুন গান শোন্।" এ কথায় বালকের ক্রোধ হইল—কি, দুঃখ হইল, বুঝিতে পারা গেল না; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিল। তৎপর দিবসই দেখা গেল, টিনের গ্রামোফোন্ প্রস্তুত করিয়া বাজাইবার ভানে প্রফুল্ল মুখে 'আয় রে আয় হরি বোলে বাহু তুলে নাচি আয়' গাহিতেছে। প্রফুল্ল যখন এই গানখানি গাহিতেছিল, তখন সে ভাবে বিভোর—কপাল বহিয়া অল্প অল্প ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিতেছে—চক্ষু জলসিক্ত, যেন পদ্মপত্রে বারিকণা, নাড়া পাইলেই পড়িয়া যাইবে। ইহাকেই কি সহজ প্রেমাশ্রু বলে!

অন্যান্য খেলার মধ্যে সে দাদাদের সঙ্গে 'ড্রিল' শিক্ষা করিত। পল্টনের পাকা সেপায়ের মত 'ফাইলে' দাঁড়াইয়া; সে যেরূপ ভাবে অঙ্গসঞ্চালনাদি-ক্রিয়া করিত, তাহার ক্রীড়া-সহচরেরা এ পর্য্যন্ত তাহার অনুকরণ করিতে পারে নাই।

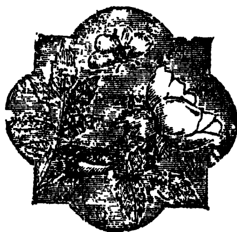
প্রফুল্লের আর এক খেলা ছিল—কাগজে হরিনাম লিখিয়া বাটীর দেয়ালে দেয়ালে লট্‌কাইয়া দেওয়া। 'ফাগুয়া'র দিন আধ্‌খানা আলুতে 'গাধা', 'বাঁদর' প্রভৃতি খোদিত করিয়া কালি লাগাইয়া, লোকের গায়ে 'ছাব্'

দিয়া, কৌতুকশীল ক্রীড়াসক্ত দুষ্ট বালক যেরূপ আনন্দ করে, প্রফুল্ল সেইরূপ হরিনামের ‘ছাব্’ কসাইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইত। কলিকাতায় প্লেগের ভয়ে যখন হরিনাম সংকীর্ত্তনের তুমুল আন্দোলন, সেই সময় হইতে বালকের এই খেলাটীর আরম্ভ হয়। এ খেলায় যদি কেহ তাহাকে বিদ্রূপ করিত, কিম্বা কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে সে অতি গম্ভীর ভাবে বলিত, “তুমি চুপ্ কর, ঠাকুর রাগ কর্ব্বেন।”

তাহার অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকগণের সহিত সে বড় একটা মিশিতে চাহিত না। ফাগুবাবুর খেলার সাথী—মোহন, মলিনা, বিমান, বিকাশ, ‘নীনজাবালা’ (নীরজাবালা), মাধুরী, মঞ্জরী প্রভৃতি দুই তিন চারি বৎসরের বালক বালিকা। গান শুনিবার ইচ্ছা হইলে ‘ওদো’দাদার সঙ্গে ভাব হইত। শিশুরা স্বভাবতঃ পবিত্রাত্মা। বোধ হয়, সেই জন্যই শিশু-বন্ধু পাইলে ফাগুবাবুর এরূপ উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ হইত।

প্রফুল্ল কিছুতেই অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিত না। স্বাধীনতার প্রবল প্রবৃত্তি তাহার প্রত্যেক কার্য্যে

লক্ষিত হইত। প্রফুল্লের মতেই তাহার খেলার সাথীদের চলিতে হইত। সে কখনো কাহাকেও বলে নাই যে, তাহার মতে সকলকে চলিতে হইবে। কিন্তু তাহার প্রকৃতিতে এমন একটী শক্তি ছিল যে, তাহারই প্রভাবে সকলেই তাহার মতে চলিতে বাধ্য হইত। এটা বুঝি Will Force—ইহাই বুঝি মনের চৌম্বক বল, ইচ্ছাশক্তির অজেয় আকর্ষণ!





বিদ্যাভ্যাস ও চরিত্রবৈচিত্র্য।

অনেক সময়েই দেখা যাইত, প্রফুল্ল নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। শান্ত শিষ্ট বালকেরা যেমন দিবারাত্র পুস্তক-হস্তে গৃহের কোণে বসিয়া থাকে, প্রফুল্ল সেরূপ থাকিত না; সে সেরূপ প্রকৃতির ছিল না। যখন সে খেলা করিত, তখন সে খেলাই করিত; যখন সে পাঠ করিত, তখন সে একান্তভাবে পাঠই করিত। শিক্ষক কিম্বা অন্য কোনো গুরুজন যখন কোনো বিষয় তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন, তখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় একীভূত হইয়া যেন বিষয়টীর ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিত। অন্য বালকে যাহা দশবার পড়িয়াও, দশবার জিজ্ঞাসা করিয়াও বুঝিতে পারে না, প্রফুল্ল তাহা

একবার পাঠ করিয়া, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া লইত। তাহার মেধা, বুদ্ধি ও প্রতিভা অলৌকিক ছিল। তিনের সমন্বয়ে তাঁহার কার্য্যও অলৌকিক ছিল। অধিক-ক্ষণ পাঠাদি কার্য্য করিতে হইলে সে বড় বিরক্ত হইত। তাহার পিতা তাহাকে পড়িবার কথা বলিলে, সে প্রথমতঃ হাসিয়াই উড়াইয়া দিত। অধিক পীড়ন করিলে, বালক পুস্তকখানি দুই চারি বার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিত,—"এই নিন্, পড়া হয়েছে।" পড়া বলিবার সময়ে তাহার একটুও আট্‌কাইত না।

সকল বিষয় সে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিত; "এটা কেন এমন হইল, ওটা কেন অমন হইল",—এইরূপ প্রশ্ন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। যতক্ষণ একটা বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিত, ততক্ষণ সে কিছুতেই ছাড়িত না।

এক দিনের কথা বলি। প্রফুল্ল শিক্ষকের নিকটে অঙ্ককসার সূত্রে বলিল,—"নয়ের (ইংরাজী ৯) পুঁটলি নাবে।" ছাত্রের 'পুঁট্‌লি'র কথা শুনিয়া শিক্ষক হাসিয়া উঠিলেন এবং নয়ের পুঁট্‌লি যে নাবে না, তাহা

বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ছাত্র তাহা বুঝিতে চায় না। সে বলে, নয়ের পুঁটুলি নাবিয়া যাইলেই, হাতে এক্ থাকে। এ কথার মীমাংসা করিতে শিক্ষক মহাশয় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন। প্রফুল্ল অবশেষে বুঝিল, নয়ের পুঁট্‌লিটা আর নাবে না—সেটা যেখানকার জিনিস্ সেইখানেই থাকে। প্রফুল্লের 'পুঁট্‌লি' লইয়া তাহার 'জুইলি দাদা' 'খোকা দাদা' প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়ই রহস্য করিত। তাহাতে সে চোখ্‌টী নাড়িয়া, হাত দুইখানি দুলাইয়া, মৃদু হাসিয়া বলিত "অ্যাঁ!"

'নয়ের পুঁট্‌লিনাবা' ব্যতীত প্রফুল্লের শব্দভাণ্ডার অনেক নবোদ্ভাবিত রহস্যপূর্ণ শব্দে পরিপূর্ণ ছিল। তাহার অলৌকিক প্রশ্ন এবং কৌতুকোদ্দীপক কথাগুলিটায় স্বভাবকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই মধুময় ভাবটী মনে পড়ে—

"Those obstinate questionings
Of sense and outward things,
Falling from us, vanishings;
Black misgivings of a creature
Moving about in worlds, not realized."

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বোধ হয় প্রফুল্ল-প্রকৃতির বালক দেখিয়া কবিতার এই অংশটীর রচনা করিয়াছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরাজী পড়িবার ধরণ-ধারণ অতীব প্রশংসনীয় ছিল। পড়িবার কালে মাত্রার প্রতি ও উচ্চারণের প্রতি তাহার এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত যে, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। এখনো তাহার 'The boy stood on the burning deck,' 'উঠ মা উঠ মা ভারতজননী,' 'জয় ভারতের জয়,' 'একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক্' প্রভৃতি কর্ণকুহরে বীণার ঝঙ্কার করিতেছে—এখনো তাহার পড়িবার কালের ভাবভঙ্গী স্মৃতি-মন্দিরে জাগরূক আছে—তাহা বিস্মৃত হইবার নহে।

প্রফুল্ল যেমন মিষ্টভাষী ছিল, তেমনি বিনয়ী ছিল। তবে আপনার কার্য্যোদ্ধারের সময় সে 'নাছোড়বন্দা' হইয়া পড়িত। কিন্তু সে 'নাছোড়বন্দাপণায়' কিছুমাত্র কঠোরতা প্রকাশ পাইত না। তোমার নিকটে কোনো কার্য্যোদ্ধারের আবশ্যকতা হইলে সে তোমার কাছ্‌ছাড়া হইবে না, তোমার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া দশবার

"অ্যাঁ, অ্যাঁ" করিবে, তোমার মনে করুণার উদ্রেক করিবার নিমিত্ত শত প্রকার চেষ্টা করিবে, আপনি হাসিয়া তোমায় হাসাইবে;—সে না করিবে, এমন কাণ্ডই নাই। ইহাই ছিল তাহার স্বভাবজ কৌশল। এরূপ ব্রহ্মাস্ত্র যাহার অধিকারে আছে, তাহার আর কার্য্যোদ্ধারের ভাবনা কি? সে কার্য্যোদ্ধার করিয়া হাস্যোল্লাসে নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইত;—আর, যাঁহার নিকট হইতে কার্য্যোদ্ধার হইল, তিনি অনিমিষ নয়নে বালকের কুরঙ্গের মত কুর্দ্দন দেখিতে দেখিতে বিমুগ্ধ হইতেন।

সত্যে তাহার প্রবল অনুরাগ ছিল। বালকবুদ্ধিতে সচরাচর অনেক বালক যেরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, কিম্বা দোষ করিয়া দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করে, প্রফুল্ল কদাচ সেরূপ করিত না; সে মিথ্যার দিক্ দিয়াও যাইত না। তাহার পিতা তাহাকে পড়াইয়াছিলেন—

"Speak the truth and speak it ever,
Cost it what it will.
He who seeks to hide the truth,
Does the wrong thing still."

বর্ণে বর্ণে সে এই উপদেশ পালন করিত। সে দোষ করিয়া সরলভাবে তাহা স্বীকার করিত, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সেরূপ দোষ আর না ঘটে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত। এই চেষ্টার ফলে বালকের আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান বিশেষরূপে পরিপুষ্ট হইয়াছিল এবং উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। সে উৎকর্ষসাধনের মূল, প্রফুল্লের জনকজননী। তাঁহারা পুত্রকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত না করিয়াও, কখনো কোনোরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ না করিয়াও, সুশাসনে রাখিবার শক্তি ধারণ করেন; সদালাপে, গল্পচ্ছলে, নৈতিক উপদেশটুকু শিশুর কোমল হৃদয়ে খোদিত করিয়া দিতে তাঁহারা সদা সুদক্ষ; শিশুর সহিত শিশু সাজিয়া, সহজভাবে সৎশিক্ষা দিতে তাঁহারা সদা সচেষ্ট; সে পক্ষে পটুতা তাঁহাদের বিলক্ষণ আছে। অতএব প্রফুল্লের আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান না থাকিবে কেন, বুদ্ধি-প্রখরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইবে কেন, সত্যে অনুরাগ না জন্মিবে কেন? যাঁহারা পুত্রকে চোরের অধিক শাস্তি দিয়া 'পাঠশেলে' গুরু মহাশয়েরও কাণ কাটিয়া ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা প্রফুল্লের পিতামাতার দৃষ্টান্তটী মনে

রাখিলে তাঁহাদের দুষ্ট সন্তান শিষ্ট হইয়া আত্মীয়বর্গের ও সমাজের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারে।

প্রফুল্ল নিতান্ত সরল প্রকৃতি হইলেও দারুণ অভিমানী ছিল। কিন্তু সে অভিমান লোকসমাজে প্রকাশ পাইত না। যদি তাহাকে অভিমানের কান্না কাঁদিতে হইত, তবে সে ছাদের উপর কিম্বা অন্য কোনো নির্জ্জন স্থানে চলিয়া যাইত। 'ছিঁচ্-কাঁদুনে' অভিমানের সে বড় তোয়াক্কা রাখিত না। আর একটা কথা;—বৃথাভিমান তাহার আদৌ ছিল না।

এই বয়সে বালক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব-সুখের উপভোগ করিবার অধিকারী হইয়াছিল। নির্ম্মলচন্দ্র ও অমিয়নাথ প্রফুল্লের সহপাঠী ও প্রাণের বন্ধু। প্রবীণ বয়সে লোকের যেরূপ বন্ধুত্ব ঘটিয়া থাকে, ইহাদের বন্ধুত্বও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। পরস্পরে মনের কথা কহিত, পরস্পরে সমবেদনা সহানুভূতি প্রকাশ করিত, পরস্পরের মধ্যে দ্রব্যাদির আদানপ্রদান চলিত, এবং পরস্পরে বন্ধুত্বের হিসাব নিকাশ করিত। নির্ম্মলের নির্ম্মলতা দেখিয়া এবং অমিয়ের অমিয়ধারায় পরিতৃপ্ত হইয়াই,

বোধ হয়, প্রফুল্ল তাহাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয় ছিল। তাহার আর একটী বন্ধু ছিল—'গিঞ্চ দাদা'। গিঞ্চ দাদার নাম, তুলসীচরণ। তুলসী অভ্রভেদী শালবৃক্ষ না হইয়াও অতি পবিত্র। সে পবিত্রতায় দীনতা ভাসিয়া যায়, সুকুমার ভাব মনে উদিত হয়, করুণার উৎস ফুটিয়া উঠে। পবিত্রপ্রাণ প্রফুল্লচন্দ্র তুলসীকে বন্ধু ও আত্মীয়রূপে পাইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উপভোগ করিত। তুলসী-সংযোগে প্রফুল্লের প্রফুল্লতা শতগুণে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল।

প্রফুল্ল সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত এবং কাহাকেও অপরিষ্কার দেখিলে তাহাকে পরিষ্কার থাকিবার জন্য অনুরোধ করিত। দেবশিশু বুঝিয়াছিল—পরিচ্ছন্নতাই পবিত্রতা। সেইজন্য পরিচ্ছন্নতায় তাহার এত অনুরাগ ছিল।

'গুছানো' স্বভাবটুকুও তাহার বিলক্ষণ ছিল। কবে কোন্ পুতুল্‌টী তাহার মাতা তাহাকে দিয়াছিলেন, কবে কোন্ আত্মীয় একটী খেলানা দিয়া শিশুর ক্রন্দন থামাইয়াছিলেন, কোন্ কালে সে একখানি রঞ্জিত বস্ত্র

উপহার পাইয়াছিল—সেগুলি এখনো সেইরূপ অবস্থাতেই বর্ত্তমান। পিতার নিকট হইতে দুই এক টাকা করিয়া পাইয়া সে যাহা জমাইতে পারিয়াছিল, তাহা এখনো সেভিংস্ ব্যাঙ্কে রহিয়াছে। তাহার অধীত পুস্তকগুলি এখনো এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, তাহা দেখিলে নূতন বলিয়া ভ্রম হয়। পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি, সেই পবিত্র বালকের 'গুছানো' স্বভাব ও পরিচ্ছন্নতার স্মৃতি রক্ষা করিয়া এখনো গৃহে শোভমান। হায়, সে স্মৃতি কুল-কাষ্ঠের জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বালাময়ী!

প্রফুল্লের অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। সে সমস্ত বিষয়েই, ঘাঁটিয়া খুঁটিয়া, তলাইয়া মূলাইয়া, একটা কিছু নূতনত্ব বাহির করিবার চেষ্টা করিত। বাড়ী দেখিয়া সে বাড়ী প্রস্তুত করিত, পুষ্করিণী দেখিয়া পুষ্করিণী বানাইত, কুঞ্জকাননের অনুকরণে কানন তৈয়ারী করিত কিন্তু তাহাতে এমন একটা কিছু নূতন সামগ্রীর সমাবেশ করিত যে, লোক-দৃষ্টির অগোচরে তাহা থাকিতে পারিত না।

বালকের একটী খেয়ালের কথা ছিল—"না ত"। যখন সে ঘাড় নাড়িয়া, সুচঞ্চল চক্ষু অচঞ্চল করিয়া,

বলিত—“না ত”, তখন মনে হইত, সে বুঝি দেবলোকের কথা—নহিলে তাহাতে এত মিষ্টতা থাকিবে কেন!

ফাগুবাবুর আনন্দময়ী ন কাকীমা বালকের মুখে এই “না ত” কথাটী শুনিয়া অতীব আনন্দ উপভোগ করিতেন। সেই কারণে, ফাগুবাবু যাহাতে সেই কথাটী পুনঃপুনঃ বলে, তাহারও তিনি চেষ্টা করিতেন;—যে সকল কথার উত্তরে “হাঁ” না বলিয়া “না” বলিতে হয়, এমন কথা কহিতে থাকিতেন। ফাগুবাবু তাহা বুঝিয়াছিল। সেই জন্য সে সাধ্যপক্ষে ন কাকীমার কর্ণগোচরে “না ত” বলিত না। প্রফুল্ল তাহার ন কাকীমার সমধিক প্রিয় ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া স্নেহের প্রতিদানে “না ত” কথাটীর নবীনত্ব, বিশেষত্ব ও মাধুর্য্য নষ্ট করিতে সে কিছুতেই রাজী হইত না। “না ত” না বলিলে ন কাকীমা তাহার সঙ্গে ‘খেলা’ করিতে চাহিতেন না। কিন্তু ফাগুবাবু কাকীমার অঞ্চল ধরিয়া, গায়ে পড়িয়া তাঁহাকে খেলিতে বাধ্য করিত।

প্রফুল্লের বয়স এখন নয় বৎসর। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হইয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই

"বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া, দেশের হিতসাধন কার্য্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। প্রখর আতপতাপে দগ্ধ হইয়া, প্রবল বৃষ্টি ধারায় অভিষিক্ত হইয়া স্বদেশ-সেবকগণ দলে দলে মিলিয়া সভাসমিতি করিতেছেন। ভারতসন্তান যাহাতে জননী জন্মভূমির সেবায় ভারত-ভূমির হিতে মনপ্রাণ উৎসর্গ করে, যাহাতে একতাবন্ধন হয়, যাহাতে ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে দেশের দ্রব্যই দেশে ব্যবহৃত হয়, সকল ভারতসন্তান এই সকল বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন। প্রফুল্লও মাতৃমন্ত্রে মাতিয়া উঠিল। দাদাদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, "বন্দে মাতরম্" নিশান ঘাড়ে করিয়া, সেও সভাসমিতিতে যোগদান করিল; ৩০শে আশ্বিন—বঙ্গচ্ছেদের দিনে—সে অন্ন গ্রহণ করিল না; পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া 'রাখীবন্ধন' করিল। সভাসমিতির পর যখন সে বাটী প্রত্যাগমন করিত, তখন তাহার শুষ্ক মুখ, রুক্ষ কেশ, ধূলিধূসরিত চরণ; আত্মীয়েরা নয় বৎসরের বালকের এরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া, বিমুগ্ধ হইতেন—বালক প্রফুল্ল পর্য্যন্ত স্বদেশভক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছে!

এ সকল সমিতি-সভায়, সম্মিলন-সমবায়ে যোগ দিয়াও বালক তৃপ্ত হইত না—ইহাতে তাহার মনস্তুষ্টি হইত না। সে তাহার মা, ন কাকীমা প্রভৃতিকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', 'সোণার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি', 'অয়ি ভুবনমোহিনী' প্রভৃতি স্বদেশসঙ্গীত গাহিত। কিন্তু তাহাতে একটুও প্রগল্ভতা থাকিত না।

'নারায়ণী সাধনচক্রে', নারায়ণীগণ সম্মিলিত হইলে, প্রফুল্ল দেশের কথা আন্দোলন করিত এবং সেও যে দেশের কার্য্যে প্রাণ মন উৎসর্গ করিবে একথা—ধীর গম্ভীরভাবে বলিত। 'চক্র'টী তাহার নূতন কাকা কর্ত্তৃক স্থাপিত এবং সেই চক্রের বালকগণের নাম 'নারায়ণী'। চক্রের উদ্দেশ্য মহান্। সে চক্রে প্রবেশ করিতে হইলে বালগকণকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, "কৃষ্ণে ভক্তি রাখিব", "গুরুগণে ভক্তি করিব", "বিলাস বর্জ্জন করিব", "দেশের হিতে প্রাণমন উৎসর্গ করিব।" চক্রটী সুব্যবস্থায় চালিত হইলে, এক দিন দেশের মহৎ কার্য্য সাধন করিবে।

বালক প্রফুল্লের হৃদয়-বলও যথেষ্ট ছিল। তাহার স্বাধীন-সৎপ্রবৃত্তিকে কেহ বড় বাধা দিতে পারিত না। সে একবার যাহা সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেই করিবে। নিম্নোক্ত ঘটনায় রহস্য প্রকাশ পাইবে।

প্রফুল্ল আত্মীয়গণের সঙ্গে মধুপুরে বেড়াইতে গিয়াছে—বয়স তখন চারি বৎসর মাত্র। মধুপুরের 'বট গাছ' দেখিবার জন্য সকলে বাটী হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে প্রফুল্ল বায়না ধরিল, "আমিও বটগাছ দেখিতে যাইব।" কিন্তু চারি বৎসরের শিশুকে এতটা পথ হাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া কেহই সমীচীন মনে করিলেন না। অতএব প্রফুল্লের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। আর কিছু না বলিয়া বালক বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। সকলে বটবৃক্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সকলে দেখিতে পাইলেন, শ্রীমান্ ফাগুচন্দ্র উলঙ্গাবস্থায় ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। তখন সকলে আর কি করেন—শ্রীমান্‌কে ক্রোড়ে তুলিয়া গন্তব্য স্থানে চলিলেন।

আর এক দিনের কথা;—প্রফুল্ল পিতামহীর সহিত ৺কাশীধামে গিয়াছে। বেণীমাধবের ধ্বজায় উঠিবার দিন সে বলিল, "আমিও ধ্বজায় উঠিব।" পিতামহী আদর করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় হ'লে উঠ্‌বে দাদা।" কিন্তু সে কথায় কে তখন কর্ণপাত করে? বালক বেণীমাধবের ধ্বজার অত্যুচ্চ দেশে উঠিয়া তবে ছাড়িয়াছিল। এ ঘটনা মধুপুরে 'বটগাছ' দেখিবার অব্যবহিত কাল পরেই ঘটে।

ভয় কাহাকে বলে—প্রফুল্ল আদৌ তাহা জানিত না। অন্ধকারময় নিশীথে সঙ্গিবিহীন হইয়া সে জনহীন স্থানে যাইতে পারিত। কেহ ভয় দেখাইলেও ভয় পাইত না। প্রফুল্লের পিতা পুত্রগণের সাহসের পরিচয় গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া এক রাত্রিতে প্রভাতচন্দ্রকে একটু ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, 'মেঘা, (প্রভাতের ডাক্ নাম), ওটা কি বল দেখি?" মেঘ্ সে কথায় যেন একটু থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু ফাগুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে বলিল, 'ওটা? ওটা আবার কি? কিসের একটা ছায়া প'ড়ে ঐ রকম নড়্‌ছে। দাদা ভয় পেয়েছিল বুঝি?"— ফাগুবাবু যেন মেঘ্‌বাবুর দাদা!

কিন্তু মেঘ্ তাহাতে অসন্তুষ্ট ছিল না। পরন্তু, ফাগু-বাবুর মতেই সে মত প্রকাশ করিত। মেঘ্কে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, "ফাগু জানে।" নূতন পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার সময়ে কিম্বা কোনো নূতন স্থানে বেড়াইতে যাইতে হইলে মেঘ্ ফাগুবাবুর বিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া, আপন স্কন্ধ হইতে দায়িত্বের বোঝা নামাইয়া ফেলিত—এবং আহারাদি ব্যাপারের নূতনত্বের কথা উত্থাপিত হইলে, সে ভারও ফাগুবাবুর উপর চাপাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিত। মেঘ্বাবুর অপেক্ষা ফাগুবাবু তিন বৎসরের ছোট। দুই ভা'য়ে বড় ভাব—একজন অন্য জনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তাহারা এক বৃন্তের দুইটী পবিত্র ফুল।

ফাগুবাবুর দুর্জ্জয় সাহসের পরিচয় 'ইঞ্জিন দাদা'তে পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরো দুই একটী কথা বলিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক বা অনাবশ্যক বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে না।

প্রফুল্লের ঋষিকল্প পিতামহ কার্য্যক্ষেত্র হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিলেই প্রফুল্ল

ঝটিতি সে গাড়ী দখল করিয়া বসিত। এক দিন কোচ্ম্যান কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ফাগুবাবু কোন্ অধিকারে গাড়ী চড়িয়া বসে।" প্রফুল্ল তাহাতে একটুও অপ্রস্তুত বা কুণ্ঠিত না হইয়া বলিল, "তুই আমার দাদামণিকে চিনিস্?" কোচ্ম্যান্ হাসিয়া বলিল, "না, হুজুর, কেমন করিয়া চিনিব?" সে কথায় বালক গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিল, "আশ্চর্য্য, দাদামণিকে সবাই চেনে, আর তুই চিনিস্ না! আমার দাদামণি ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী। তাঁর গাড়ী, তাই চড়ি—তুই ধম্‌কাইবি কেন?" সে স্থানে যাহারা দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা বালকের বাক্যকৌশলে চমৎকৃত হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

আর এক দিন প্রফুল্ল যখন গাড়ী দখল করিয়া বসিয়াছিল, সেই সময়ে ঘোটকরাজ নিদারুণ দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিবার আশায় একটু লাফালাফি আরম্ভ করে। কিন্তু কোচ্ম্যান্ তাহাকে মুক্তি-প্রদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় অশ্বপ্রবর

অবশেষে শান্তভাব ধারণ করিল। তখন প্রফুল্ল গাড়ী হইতে মুখটা বাড়াইয়া কোচ্‌ম্যানকে বলিল, "আথ্‌, তুই যখন ঘোড়া সাম্‌লাইতে না পারিবি, তখন রাস্‌ আর চাবুকগাছটা আমায় দিস্‌। যত বড় বজ্জাত ঘোড়াই হউক্‌, আমার হাতে পড়্‌লেই দোরস্ত হ'বে।" এই বলিয়া বালক হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসিটা তাহার রোগ!

প্রফুল্লের অপরিসীম সঙ্গীতানুরাগ ছিল। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় তাহার ভাব-বিলাস বিপুল হৃদয়-সরোবর উথলিয়া উঠিয়া নেত্রদ্বারে শান্তি-প্রস্রবণ সৃষ্টি করিত। বিশুদ্ধ সঙ্গীত শ্রবণ করিলে সে আত্মহারা হইয়া পড়িত।

একদা সন্ধ্যাসমাগমে বাটীতে ধ্রুপদ সঙ্গীত হইতেছে—বাটীর অন্যান্য বালকেরা আলস্যবশতঃ হাই তুলিতেছে; কেহ বা খেলায় মত্ত রহিয়াছে। প্রফুল্ল কিন্তু দ্রবময়ী সঙ্গীতধারায় আপ্লুত ও আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। সে সময়ে তাহাকে ডাকিয়াও তাহার সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নাই।

বাটীর দাসদাসী ও পথের ভিক্ষুকের প্রতি

ধালকের অসীম দয়া ছিল। ফাগুবাবু বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিলে অতিথিকে কখনো রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইত না। দাসদাসীরা ফাগুবাবুর কথায় মরিত বাঁচিত।

যে দাসীটীর ক্রোড়ে প্রফুল্ল লালিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'শকুলির মা।' শকুলির মা প্রফুল্লকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত; ফাগুবাবুও দশগুণ ভাল-বাসিয়া তাহার ভালবাসার প্রতিদান করিত। শকুলির মা'র সহিত কেহ কর্কশ ব্যবহার করিলে 'ফাগিয়া বেটী' অশ্রুধারায় তাহার বেদনার উপশম করিত। এই মোহমন্ত্রে পড়িয়া শকুলির মা 'ল্যাড়্কা ছাওয়াল্' ভুলিয়া 'ফাগিয়ারাণী'র পরিচর্য্যায় আত্মসমর্পণ করিয়া-ছিল; সে বহুকাল দেশের মুখ দেখে নাই। অন্য কাহারো সম্মুখে কটিদেশ হইতে বসন খসিয়া যাইলে লজ্জায় প্রফুল্লচন্দ্রের গণ্ডস্থল আরক্তিম হইত; কিন্তু শকুলির মা'র সম্মুখে 'ফাগিয়া' উলঙ্গ হইতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না। কারণ, পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়াছিল।

প্রফুল্ল সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল। চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া প্রকৃতিসুন্দরী যখন মোহনবেশে স্থাবর জঙ্গমের উপর আধিপত্য করিত তখন শিশু প্রফুল্ল চন্দ্রমা-পানে চাহিয়া চাহিয়া ঘুমাইয়া পড়িত; যখন কাকলীচ্ছলে বিহগকুল জগদীশনাম কীর্ত্তন করিত, তখন প্রফুল্ল সে সুধাধারা আকণ্ঠ পান করিয়া ভাব-বিভোর হইয়া পড়িত; প্রবল বাত্যাসংযোগে অবিরল বৃষ্টিধারা ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে পতিত হইয়া যখন প্রকৃতির সহিত বিপর্য্যয় যুদ্ধ করিত, তখন প্রফুল্ল ভাবাবেশে ঢলিয়া পড়িত; দামিনীর উদ্দাম চাপল্য দেখিয়া সে ভাবিত—দামিনী কি সুন্দরী! ব্যোমবিহারিণী কাদম্বিনী দেখিয়া প্রফুল্ল মনে করিত, তাহারা দেবহস্তী—শুণ্ডযোগে জলধারা নিক্ষেপ করে; জীমূতগর্জ্জন শুনিয়া বালক আনন্দে অধীর হইত; সে বুঝি কল্পনা করিত, ইহাই ব্যোমের ওঙ্কারধ্বনি!

প্রফুল্ল বড় একটা কাহারো সঙ্গে মিশিতে চাহিত না। অনেক সময়েই সে আপন মনে আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। অথচ, এমনি ভাবে সে আপনাকে চালাইত যে, তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেহ মনে করিতে

পারে নাই—সে কাহারও অবাধ্য কিম্বা অশিষ্টাচার-দুষ্ট। তাহার মতের সহিত যদি কাহারো মতের অমিল হইত, তবে ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া সে এমনি সহজ সরল সরস কোমল ভাবে, এমনি মিষ্ট ভাষায় আপন মত প্রকাশ করিত যে, অবশেষে সকলেই তাহার মতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িত।

এই কথাপ্রসঙ্গে একদিনের ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। সরস্বতীপূজা—জেঠা কাকাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া বালকেরা সরস্বতী পূজা করিবে। তাহারা দল বাঁধিয়া বড় জেঠাবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের প্রাপ্য গণ্ডা দাওয়া করিল। 'জেঠা বাবু' কৌতুক করিয়া বলিলেন, "যা, তোরা পয়সা নষ্ট করিস্, তোদের একটী পয়সাও দিব না।" অন্যান্য বালকেরা থতমত খাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। প্রফুল্ল ভাবিল, জেঠাবাবুর এ মতটী অভ্রান্ত নহে—অতএব তাঁহার মত বদ্‌লাইতে হইবে। বালক অগ্রসর হইয়া তাহার প্রতিভা-উদ্ভাসিত স্নিগ্ধ বিশাল নেত্রযুগল জেঠাবাবুর মুখের উপর স্থিরভাবে ন্যস্ত করিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়

স্বরে বলিল, "টাকা আপনাকে দিতে হবে যে! না দিলে চল্‌বে না।" জেঠা বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ফাগু বাবুর মতেই মত দিলেন।

ফাগুবাবুর সাধ ছিল—রুগ্নাবস্থাতেও, "ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে" বলিয়া বাণী বিদ্যাপ্রদায়িনী সরস্বতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার সে সাধ অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তবে, দেবীকে প্রণাম করিতে প্রফুল্ল বিস্মৃত হয় নাই।

প্রফুল্ল জীবিত থাকিলে, বোধ হয়, কবি হইতে পারিত। এক দিনের ঘটনা মনে পড়ে। গ্রন্থকারের এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ। সেই বিবাহোপলক্ষে, অনুরুদ্ধ হইয়া, তিনি একটী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অনুকরণে ফাগুবাবু একটী কবিতা লিখিয়া গ্রন্থকারকে দেখায়। শ্রীমানের বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র। সে কবিতাটী মুদ্রণযোগ্য না হইলেও উল্লেখযোগ্য বটে—কারণ, বালক-হৃদয়ের কমনীয় ভাবগুলি সে কবিতায় এক প্রকার বেশ প্রকাশ পাইয়াছিল। শিশুকবি ফাগুবাবু মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিত।

প্রফুল্ল-চরিত্রের আর একটু বৈচিত্র্য ছিল। সে অগাধ নিদ্রায় অভিভূত—ঢক্কা-নিনাদেও তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবে না; কিন্তু পথে হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দল নাম কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছে, সে তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক বেগে উঠিয়া পড়িবে। বালকের হরিভক্তি অপরিসীম! ধ্রুব-প্রহ্লাদ-ভাব অনেক শিশুচরিত্রে যেন স্বভাবতই অঙ্কুরিত হয়। অনুকূল উপদেশ-সলিল পাইলে অনেক শিশু-হৃদয়েরই ঐ পবিত্র অঙ্কুর পূত পাদপে পরিণত হইতে পারে।





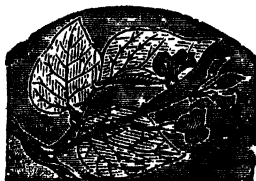
রোগ-শয্যায়।

কাল-বৈশাখীর দিনে দিবাবসানে এক খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ আকাশ-প্রান্তে উদিত হইয়া যেরূপ সমস্ত গগন ছাইয়া ফেলে, পরে প্রবল ঝটিকা-সহকারে প্রশান্ত তটিনী-হৃদয়কে যেরূপ তরঙ্গ-সমাকুল করে, সেইরূপ এক ক্ষুদ্র ব্যাধি-বিন্দু প্রফুল্লের শরীরে প্রবিষ্ট ও উদিত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল—সর্ব্বেন্দ্রিয়-সমন্বিত সমস্ত শরীরকে আকুল করিল। রোগ—প্রফুল্লের একার নহে। প্রভাত ও প্রফুল্ল—দুই ভাইয়ে অপার্থিব ভালবাসা, দুষ্ট রোগ কি একজনকে ছাড়িয়া অন্য জনকে আক্রমণ করিতে পারে? প্রফুল্লচন্দ্র ও প্রভাতচন্দ্র সেই একই রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল।

রোগ—Typhoid fever, আর্য্য আয়ুর্ব্বেদিকেরা বলিতে পারেন, 'ত্রিদোষজ সান্নিপাতিক আন্ত্রিক বিকার।'

রোগ-শয্যায় দুই ভাইয়ে পাশাপাশি শয়ন করিয়া আছে। চিকিৎসার ত্রুটি নাই, চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্মত পরিচর্য্যার পরিসীমা নাই; কিন্তু তথাপি রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা অবশ্য ভয়ের কথা;—আত্মীয়েরা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রফুল্ল রোগ-শয্যাতেও প্রফুল্ল। তাহার মুখ দেখিয়া স্বতই মনে হইত, যেন তাহার শরীরে কোনো রোগই নাই। সেই স্থির প্রশান্ত নয়ন, সেই কোমল মধুর হাসি, সেই সদানন্দ প্রকৃতি, লোকের কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে যে, ফাগুবাবু বিষম ব্যাধি-বিক্লিষ্ট। ক্রমে প্রভাত অপেক্ষা প্রফুল্লের রোগ ভীষণতর আকার ধারণ করিল। আত্মীয়-স্বজনদিগের হৃদয় আতঙ্কে অভিভূত হইল। প্রফুল্লচন্দ্রের তাহাতেও কাতর্য্য নাই—তেমন রোগও ভ্রূক্ষেপ নাই। শরীরে রোগসুলভ বিষম যন্ত্রণা নিয়ত উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু যখনি কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ফাগু, কেমন আছ", ফাগুবাবু তখনই বলিতেছে, "ভাল আছি।"

শিশুর সহজ হৃদয়-বল রোগে আরও ঘনীভূত হইয়াছে। এই অদ্ভুত গুণটীকে কি বলিব? ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, না আর কিছু? যদি আর কিছু হয়, তবে তাহার ভাষা আমার জ্ঞাত নহে। আমি ত বলিতেছি, প্রকৃত প্রকট হৃদয়-বল। যিনি প্রকৃত যোগী, তিনিই বোধ হয় সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন। যিনি নিজের অমর আত্মাকে মরদেহ হইতে পৃথক্ করিয়া কূটস্থ রাখিতে পারেন, ব্যাধিক্লিষ্ট প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়-প্রফুল্লতা তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ।





দীপনির্ব্বাণ।

পঁয়তাল্লিশ দিনের পর রোগ আজ চরমে উঠিয়াছে—প্রফুল্লের প্রফুল্ল জীবন নির্ব্বাপিত হইতেছে। বালক বুঝিল, তাহার মহাসমাধির সময় আসিয়াছে।

কালরাত্রি আর পোহায় না! আত্মীয়গণ নিশাবসানের অপেক্ষা করিতেছেন। হতাশের আশা; ঘোর অমঙ্গলেও মঙ্গল-চিন্তা—কাল রাত্রির অবসানে যদি কিছু সুরাহা হয়। আত্মীয়েরা শ্বাস থাকিতে কি কখনো আশা ছাড়িতে পারেন?

দুই ভাইয়ে এখনো পাশাপাশি শয়ন করিয়া আছে। প্রভাতকে এখনো স্থানান্তরিত করা হয় নাই—পাছে প্রভাত কিংবা প্রফুল্ল কারণ বুঝিতে পারিয়া অতি-ব্যাকুল হয়। কিন্তু অবস্থা ব্যবস্থা বুঝিতে কি আর প্রফুল্লের বাকী ছিল?—সে যে সাক্ষাৎ দেবশিশু!

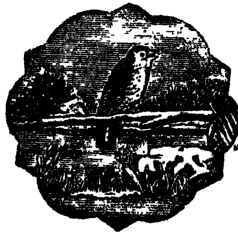
প্রফুল্ল এখনো বেশ কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কথা কহিতে কহিতে তাহার তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রাবেশে সে দ্রুত অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে লাগিল। ভগ্ন-হৃদয় পিতা পুত্রকে বাহুবেষ্টিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফাগু, ও কি কচ্ছ, বাবা?" পুত্র স্থিরকণ্ঠে বলিল, "বাবা,, আমি তারা গণ্‌ছি।" যাহা বুঝিবার, তাহা সকলেই বুঝিলেন। আশাতন্তুর সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন হইল।

অল্পক্ষণ পরেই প্রফুল্ল তাহার জননীর গলা জড়াইয়া ধরিল। সে সময়ে বালকের মুখ হইতে একটী শব্দও স্ফুরিত হইল না, একটী দীর্ঘশ্বাসও পড়িল না—চক্ষের পলক স্থির, মুখের ভাব শান্ত-গম্ভীর। জননী কণ্ঠের স্বর অতিকষ্টে সংযত করিয়া বলিলেন, "কি, ফাগু?" ফাগুবাবু তাহার উত্তরে বলিল, "না, কিছু না।" বালক

সেই যে জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, তাহা বুঝি বিদায়ের চরম অভিনয়; কিন্তু মাতাকে তাহা বুঝিবার অবসর দিল না। অল্পক্ষণ পরেই বলিল, "মা, আমার কাটা চুলগুলো ভাল ক'রে রেখেছ ত? সে গুলো ঠাকুরদের দিতে হ'বে।" মাতা "আচ্ছা" বলিয়া কর্ত্তনাবশিষ্ট কেশ-গুলি গুছাইয়া রাখিলেন। প্রসাদপুরের মানসিক চুল—প্রসাদপুরে পাঠাইতে হইবে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে ম্রিয়মাণ পিতা বর্ত্তিকালোকে পুত্রের মুখভাব নিরীক্ষণ করিতে করিতে আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছিলেন। পুত্র বলিল, "আলোটা সরাও না, বাবা।" পিতা আকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আলোটা কি তোমার চোখে লাগ্‌ছে, বাবা?" পুত্র ঊর্দ্ধ-দিকে চাহিয়া গদ্গদ স্বরে বলিল, "না, চোখে লাগ্‌বে কেন? আমি কত আলো দেখ্‌ছি। ঐ কেমন আলো! কেমন বাগান! কত ফুল! কেমন গন্ধ!" প্রফুল্ল তখন দেবলোকের আলোক দেখিয়া, মন্দার পারিজাতের সৌরভ পাইয়া, দেবলোকের কথাই কহিতেছিল। বর্ত্তিকালোক সরাইয়া রাখা হইল।

রাত্রির অবসান হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বিকম্পিত স্বরে দেবশিশু বলিল, "আমার এ দেশটা আর ভাল লাগ্‌ছে না।" সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। আত্মীয়েরা বাষ্পাকুললোচনে প্রভাতচন্দ্রকে ধরাধরি করিয়া গৃহান্তরে লইয়া গেল। প্রফুল্লের তখনো চৈতন্য লোপ হয় নাই; সে একবার দাদাকে দেখিয়া লইল, মুহ্যমান আত্মীয়গণের মুখপানে চাহিয়া দেখিল,—সে চাহনি তখনো হাসি-মাখা। তাহার পর সে যুক্তকরে কাহার উদ্দেশে কি বলিল; তাহার পর হৃদয়োপরি হস্ত দুইখানি সংরক্ষিত করিল; তাহার পর শিবনেত্র—সব শেষ! দীপ নির্ব্বাণ!





বিসর্জ্জন।

ফাগুবাবু মহাযোগে মগ্ন হইয়াছে। আত্মীয়েরা পার্শ্বে বসিয়া তপ্ত নিশ্বাস ফেলিতেছেন, আর নিঃশব্দে অশ্রুজল মুছিতেছেন। এখন শোকপ্রকাশের সময় নহে—প্রভাতচন্দ্র যে এখনো রোগ-শয্যায়!

শোকবিদগ্ধা জননী পর্য্যন্ত এ কথা বুঝিয়াছেন। তাই তিনি রোদন-কাতর নয়নের উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ করিয়া প্রভাতচন্দ্রের নিকটে যাইয়া উপবেশন করিলেন। প্রভাত মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফাগু কোথা, মা?" এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে অন্য মাতা কি করিতেন, জানি না—কিন্তু প্রভাতের জননী স্থিরবচনে,

সহজ কণ্ঠে বলিলেন,—"অস্ত্র কত্তে হবে, তাই তোমার ন কাকা তা'কে অন্য বাড়ীতে নিয়ে যাচ্চেন। ভাল হ'লেই সে আবার এখানে আস্‌বে।" রোগ-ক্লিষ্ট প্রভাত তাহাই বুঝিয়া স্থির হইল। ধন্য জননীর হৃদয়-বল! ধন্য তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা!

ফাগুবাবু বড় ফুল ভালবাসিত। বিদায় কালেও সে বলিয়াছিল, 'কেমন ফুল! কেমন বাগান!' সেই জন্য তাহার জেঠা কাকারা পুষ্প-মাল্যে প্রফুল্লের বর বপু সুশোভিত করিলেন; পরে, নিঃশব্দে দ্বিতল হইতে নিম্নতলে শবদেহ বহন করিয়া লইয়া আসিলেন। যোগমগ্ন পুত্রের সংযতবুদ্ধি পিতা, পুত্রকে বিদায় দিবার সময়, করুণকণ্ঠে বলিলেন, "ভগবান্, তোমার জিনিস, তুমি রাখ্‌তে দিয়েছিলে—বুকে ক'রে রেখেছিলেম; এখন নিচ্চ, নাও।" এই কথা বলিয়া বিগত-জীবন পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া পিতা আশীর্ব্বাদ করিলেন। অমনি কোথা হইতে লুক্কায়িত আঁখিবারি অজ্ঞাতভাবে সহস্র-ধারায় বহিতে লাগিল। খট্টাশায়িত শবদেহ স্কন্ধে লইয়া সকলে ধীরপদবিক্ষেপে শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আত্মীয়া-কুটুম্বিনীগণ নয়নবারি নয়নে মিলাইয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন।

পিতৃদাদা মোহনচন্দ্র এবং খেলার অন্যান্য সাথী প্রফুল্লকে কতকটা পথ আগাইয়া দিল। ফাগুবাবুর মেজদাদা ও সেজদাদা খুল্লতাতবর্গের সহিত শ্মশান পর্য্যন্ত চলিল। কে বলে মৃত্যুকে সুখ নাই! ফাগুবাবুর 'নূতনকাকা' বলিয়াছিলেন, "ফাগুবাবুই মজা ক'রে নিলে—আমরা শুধু কাঁধা ব'য়েই মলুম।" কথাটী বড় গভীর!

প্রফুল্ল যে আজ মর জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল—সে আজ কোন্ দিন্? ১৩১৩ সালের ১৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার। সেই দোল-পূর্ণিমা, সেই গৌরাঙ্গের জন্মোৎসব, সেই ফাগুয়া, সেই সময়—সেই সব! দোলোৎসবের আনন্দ-কোলাহলের মধ্য দিয়া মহাযোগমগ্ন পবিত্রাত্মা প্রবাস হইতে আপন দেশে ফিরিয়া যাইতেছে! জন্ম-মৃত্যু-চক্রের এমন মহামিলন সুদুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কে জানে প্রফুল্লের ভাগ্যে কেন এমনটী ঘটিল!

শবদেহে অঙ্গবিকৃতির লক্ষণ পর্য্যন্ত নাই। এখনো সেই হাসিমুখ, সেই কি-জানি-কেমন চক্ষু, সেই নিদ্রাবস্থার শান্ত ছবি! সে আনন্দময়—আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছে। নিরানন্দ কেবল তাহার মায়ামুগ্ধ আত্মীয়স্বজন।

ফাগুবাবুর রাঙ্গাকাকা, ছোটকাকা প্রভৃতি অস্ফুট হরিধ্বনি দিয়া শবদেহ ঐ চিতায় তুলিয়া দিলেন। প্রফুল্লের ফুল্লবপু আজ চিতাগ্নিতে বিসর্জ্জিত—তাহার পবিত্র আত্মা কিন্তু ধ্রুবলোকে!

"প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"

সমাপ্ত।

